Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501038 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Story of the Hopes and Disillusionment of the Middle-Class: Narendranath Mitra
মধ্যবিত্তের আশা এবং আশাভঙ্গের গল্প: নরেন্দ্রনাথ মিত্র

Dr. Debashri Mandal
Former Researcher
Bengali Department
Kalyani University

Received on: 15th May 2026
Accepted on: 28th May 2026

Abstract:
In the realm of the Bengali short story — particularly regarding narratives centered on the middle class — Narendranath Mitra is a name that immediately comes to mind and remains especially memorable. He emerged as a writer roughly around the onset of the Second World War. However, when assessing his literary timeline, his work gains its greatest significance not merely as a product of the war era itself — which accounts for only a small portion of his output — but primarily as a reflection of the post-war period. In the literary landscape, Saratchandra Chattopadhyay is widely regarded as the supreme chronicler of the life struggles of the middle class; yet, in Narendranath Mitra, we discover a worthy successor to that legacy. Narendranath Mitra's distinction did not stem from a diverse range of subject matter — for he lacked such broad experiential exposure — nor did he achieve prominence through a flamboyant or startling writing style. Rather, he told stories of familiar people using a familiar narrative voice. He never ventured beyond the bounds of his own experience; indeed, the world of his personal experience became the very universe of his art. As a writer, Narendranath Mitra was as much a man of heart as he was a man of conscience. He observed — and portrayed — life, society, and human frailties through the lens of intellect; yet, while depicting the harsh realities of existence, he sought to draw his ultimate conclusions through the dictates of the heart. This approach stemmed from his keen interest in dissecting the middle-class conscience; when portraying the sins and moral lapses of the middle-class individual, he never adopted a ruthless stance. Instead, with a sense of deep empathy and sorrow, he became their compassionate ally. Narendranath Mitra stands as the quintessential artist capturing the essence of middle-class life — its hopes and dashed expectations, its emotional depths and emotional ruptures, and the perpetual chasm between aspiration and capability. In his short stories depicting middle-class life, he did not merely highlight the moral decay of the bourgeoisie; with a profoundly artistic sensibility, he also vividly portrayed instances of their moral elevation and redemption.

Key Words:
Narendranath Mitra, Short Story, Middle Class, Hope, Elevation, Moral Decay.

মূল প্রবন্ধ

© Santiniketan Sahityapath

সাহিত্য সংসারে মধ্যবিত্তের জীবন সমস্যার শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে আমরা মনে করি শরৎচন্দ্রকে। অবশ্যই তিনি তাঁর সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক ছিলেন। তবে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে আমরা নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে পাই যাঁর স্বপ্ন ছিল নষ্ট ও বিক্ষত জীবনের পোড়ো জমিতে কোনো স্পন্দিত মুহূর্তের সন্ধান। দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানুষের জীবনকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, দেশবিভাগ মানুষের শেষ স্বপ্নকেও সমূলে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে, মানুষের সনাতন মূল্যবোধ শোষণ করে নিয়েছে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা — তবু কোনো-না-কোনো সময় সর্বনাশের মেঘে চকিতে জাগে বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের রেখা, রবীন্দ্রনাথের সেই রক্তকরবীর চারাগাছের মতোই চোখে পড়ে জীবনের মৃত্যুহীন অস্তিত্ব। সমস্ত আবর্জনার মধ্যেও জীবনের আনন্দ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে একথা অনুচ্চারে বলতে চেয়েছেন নরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সমস্ত ছোটোগল্পে।

গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিশিষ্ট, তাঁর বিচিত্র বিষয়বস্তুর জন্য নয়, কারণ সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিলনা। তিনি তাঁর চমকিত রচনাভঙ্গির কারণেও বিশিষ্টতা লাভ করেন নি। কারণ ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাতে তিনি চাননি, তিনি প্রবর্তন করেন নি কোনো নতুন গল্প আন্দোলনেরও। অত্যন্ত চেনা মানুষের গল্প শুনিয়েছেন তার চেয়েও চেনা ভঙ্গিতে, অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি কখনো যান নি, তাঁর অভিজ্ঞতার জগতই তাঁর শিল্পের জগৎ হয়ে উঠেছে। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সময়ের আবির্ভূত লেখক। কিন্তু তাঁর লেখার কাল-বিচার সামান্য-পরিমাণ যুদ্ধ-সমকাল ধরে যুদ্ধোত্তর কালের রচনা সূত্রেই বেশি তাৎপর্য পায়। গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৪৫এ। নাম 'অসমতল'। গল্পকারের মানসিকতায় যুদ্ধ সমকালের অভিজ্ঞতা যেমন সক্রিয় তেমনি যুদ্ধোত্তর কালের সমাজের ভাঙ্গান, অবক্ষয়, অসহায়তা, বিনষ্টির চিন্তা থাকাও স্বাভাবিক। এই সময়ের মধ্যবিত্ত জীবনের অস্থিত অবস্থা, অসহায়তা, মূল্যবোধের নানান সূক্ষ্ম বিপর্যস্ত রূপ বেশ কিছু লেখকের রচনাতেই প্রধান স্থান করে নিয়েছিল। চল্লিশের দশকের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর সাহিত্য রচনার পথটি বিশিষ্ট করে ছিলেন তাঁর দেখার বিশেষ কৌণিক সূত্রেই। তিনি এক সাক্ষাৎকারে নিজের লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেন — "সমাজে শঠতা আছে, ক্রূরতা আছে, তা আমি জানি। হিংসা বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্তু সমাজ জীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম।... শান্ত মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি।... জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই মহত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি।"[১] লেখার ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যতটা হৃদয়বান ছিলেন ততটা বিবেকবান হতে পারেন নি। বুদ্ধি দিয়ে তিনি জীবন, সমাজ, মানুষ, তাদের পদস্খলনকে দেখেছেন, দেখিয়েছেন তাদের মতো রূঢ় বাস্তবতায় নয় নিজের মতো করেই, কিন্তু হৃদয় দিয়ে সে সবের সিদ্ধান্ত টানতে সচেষ্ট হয়েছেন। কারণ তিনি মধ্যবিত্ত বিবেকের ব্যবচ্ছেদ করতে উৎসাহী, কিন্তু বিবেককে বর্জন করতে এতটুকুও আগ্রহী নন। তিনি বাস্তবিক অর্থেই রোমান্টিকপ্রিয়। মধ্যবিত্ত মানুষের পাপ ও পদস্খলনের চিত্র আঁকার সময় তিনি নির্মম হননি বেদনাহত হয়েই বরং তার সহমর্মী হয়েছেন।

মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আশাভঙ্গ, অনুভূতি ও অনুভূতি ভঙ্গ, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে যে ব্যবধান তারই রূপকার হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সব লেখকই তাঁর নিজের চেনাজানা গণ্ডির মধ্য থেকেই তাঁর গল্পের উপাদান সংগ্রহ করেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি তার তাঁর গল্প লেখার গল্পে সে কথা বলেছেন — "সব লেখকই নিজের চেনাজানা গণ্ডির ভিতর থেকে গল্পের উপাদান পেয়ে যান। আমিও তাদের ব্যতিক্রম নই।"[২]

লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলি আমাদের চেনা জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নরেন্দ্রনাথ মিত্র পুরোপুরি সমাজসম্পৃক্ত সাহিত্যিক। তিনি যেমন তাঁর ভৌগোলিক মানচিত্র অতিক্রম করেন নি, তেমনি তাঁর সময়কেও অতিক্রম করেন নি। তাঁর গল্পের মানুষগুলি যেমন আমাদের অত্যন্ত চেনা, অন্তত বাইরে থেকে মানুষকে যতটা চেনা যায়। দ্রুত সমাজের পরিবর্তনের ফলে অন্তত সেই স্তরের মানুষের অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে যাদের এককথায় বলা যায় শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজ। এই মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্বের সংকটটাই নরেন্দ্রনাথের গল্পের প্রধান অবলম্বন। উদ্বাস্তু সমস্যার ভিন্নতার জটিলতা, অর্থনৈতিক পাকচক্র, রাজনৈতিক পালা বদল প্রভৃতি আমাদের সেই কোমল মানসিকতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে এসেছে যার শেষ ধারক ও বাহক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। কথাসাহিত্যিক হিসেবে নরেন্দ্রনাথ এর পরিচিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। এই বিশ্বযুদ্ধ শুধু যে আমাদের অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা

© Santiniketan Sahityapath

ধ্বংস করেছিল তাই নয়, সেই সঙ্গো যেসব অনুভূতি সংস্কারের মত মানুষের মনকে আঁকড়ে ধরতে চায়, তাদেরও বিনষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছিল। আমাদের মনের গভীরে সেই সব অতি কোমল ও সুক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে নরেন্দ্রনাথ অবলম্বন করেছেন। সামাজিক বিবর্তনে অনুভূতির ধংসযজ্ঞ প্রায় সম্পূর্ণ বলেই নরেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন সেই কুসুমকোমল অনুভূতির সন্ধান দিয়েছেন, তেমনি সেই কুসুমে ধ্বংসের কীটের সন্ধান দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে অনেক গল্পই আমরা নরেন্দ্রনাথের লেখনীতে পাই। এখানে কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচনা করব। এর মধ্যে কোনো কোনো গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্তের সংকট। আবার কোথাও বা দেখা মিলেছে সংকট থেকে উত্তীর্ণ হবার একটা প্রয়াস।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের চরিত্রগুলির সমস্যা কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যা নয়। তা একেবারে মধ্যবিত্ত জীবনের চিরন্তন সমস্যা। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি এত জীবন্ত হয়ে পাঠকের কাছে শাশ্বত দাবি নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে। এখানে আমরা এই প্রসঙ্গো ‘অভিনেত্রী’ গল্পটি নিয়ে একটু আলোচনা করব। গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ‘যুগান্তর’ পত্রিকার তেরোশো সাতান্ন সালের পুজোসংখ্যায়। ইংরেজি চল্লিশের দশকের শেষ বছর অর্থাৎ উনিশশো পঞ্চাশ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর এর সম্ভাব্য রচনাকাল। এই গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত বা প্রায় এক নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবন্ত ছবি উপহার দিয়েছেন গল্পকার। সেই নিখুঁত বাস্তবতার সঙ্গো নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সুগভীর মানবতাবোধ গল্পের মূল লক্ষে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মধ্যবিত্ত সাংসারিক জীবনচিত্রের বাস্তবতাকে জীবন্ত করতে গল্পকার বিশেষ করে একটি চরিত্রকে স্থির লক্ষ হিসেবে নিয়েছেন। এখানে লাবণ্য অভিনেত্রী নয়, কিন্তু অভিনেত্রী হতে গিয়ে তার যে স্বভাবের কারুণ্য, বিষাদময়তা, চলচ্চিত্রের অভিনয় থেকে সংসার জীবনের অসহায় অভিনয়ে তার যে বিপরীত স্বভাব ও সার্থকতা, গল্পের প্রধান চমক সেখানেই। গল্পটি বিনয় ও তার স্ত্রী লাবণ্যের, যার কথক অনিমেষ চৌধুরী নামে এক চিত্রপরিচালক। বিনয়ের ছেলেবেলার বন্ধু অনিমেষ। বিনয়দের বাড়িতে শত দারিদ্র্যের মধ্যেও কোথাও যেন একটা অকৃত্রিম সরলতা ও আন্তরিকতার স্বাদ পায় সে। বিনয়ের একমাত্র পুত্র অসুস্থ। তার জন্য সঠিক চিকিৎসার একমাত্র উপায় সঠিক খাবার দেওয়া। এই খাবার দিতেও অসমর্থ্য বিনয়। দীর্ঘদিন টাইফয়েডে ভুগে একটি পা তার পঞ্জু হতে চলেছে। কিন্তু সত্তর টাকা মাইনের কেরানি বিনয়ের পক্ষে পুত্রের প্রতি অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া সম্ভব নয়। স্ত্রী সংসার সামলাতে পারে না। তা নিয়ে প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। এমন হীন পারিবারিক দীনতার চিত্রে অনিমেষ দেখে বিনয়ের পঁচিশ-ছাব্বিশের স্ত্রী লাবণ্যের মিষ্টি হাসি, রুগ্ন ছেলের তুলনায় সুশ্রী মুখ, ফর্সা রঙ, টানা নাক-চোখ, অভাব অনাদরের মধ্যেও দীর্ঘ দোহারা চেহারা ও অটুট স্বাস্থ্যকে। বিনয়ের সামনেই ওর কথার উত্তরে অনিমেষ জানায় ওর পার্ট টাইম চাকরি করে দেবার ক্ষমতা নেই, আবার লাজুক বিনয়ের পক্ষে ছোটো পার্ট করাও সম্ভব নয়। তবে লাবণ্যকে দিয়ে ছোটো চরিত্রের অভিনয় করানো যায়। তাতে লাবণ্য বেশ মানানসই।

লাবণ্যকে দিয়ে কম টাকার বাজেটে কাজটা করানো যাবে ভেবে অনিমেষ লাবণ্যকেই নির্বাচন করে। একসঙ্গো বেশ কিছু টাকা হাতে পাবে ভেবে লাবণ্য মনের গোপনে দারিদ্র্যের জীবনে কিছু উজ্জ্বল মুক্তির আনন্দ হিসেব করে বসে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে বিনয় স্ত্রীর অভিনয় করা মেনে নেয়। লাবণ্য স্টুডিওতে আসে স্বামী পুত্র-সহ। বারংবার অভিনয় শিখিয়েও লাবণ্য দৃশ্য তোলার সময় ব্যর্থ হয়। সে স্থানে অভিনয় করে অভিনেত্রী মালতী মল্লিক। দৃশ্য জমে ওঠে মালতির অভিনয়ে, সকলের চোখে জল এনে দেয়। বিনয় ও লাবণ্য ফিরে আসে হতাশ হয়ে। এরপর কিছুদিন পর অনিমেষের ছবি মুক্তি পাওয়ার পর দুটি পাস নিয়ে বিনয়ের বাড়ি আসে। অনিমেষের সামনেই লাবণ্য যে বাড়িওয়ালার বাড়িভাড়া আদায়ের তাগাদার সামনে পারিবারিক অসহায়তা ও আড়ষ্টতা কাটাতে অভিনয় করে, তাতে অনিমেষ বিস্ময় নির্বাক হয়ে যায়। বাড়িওয়ালা গোবিন্দবাবু বাকি দু'মাসের ভাড়া চাইতে এলে, কি অসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করে স্বামীকে মুমূর্ষু রোগী সাজিয়ে! সে অভিনয়ের এক বিস্ময়কর আবেদন! লাবণ্যর কৃত্রিম অভিনয়ের আড়ষ্টতা, ভয়, আবার অকৃত্রিম অভিনয়ের সপ্রতিভ স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব চরিত্রটিকে দুটি সত্তায় ভাগ করে। চলচ্চিত্রের অভিনয়ের সপ্রতিভ স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব চরিত্রটিকে দুটি সত্তায় ভাগ করে। চলচ্চিত্রের অভিনয়ে লাবণ্যর মুখে ছিল কৃত্রিম সংলাপ যা লাবণ্যর নয় আদৌ, যদিও বিন্তুর ওরকম অসুখ হলে সে এমন সংলাপের বাস্তবতায় ছেলের সঙ্গো বা ছেলের ব্যাপারে কথা বলতে অভ্যস্ত। অভিনয় একটা কঠিন শিল্প তা বাস্তব সংসারের যে রূপ তা থেকে আলাদা। সংসারে যে-কোনো দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বিষাদ থাক না কেন, তার সঙ্গো স্বভাবের আবেগ রক্তের সম্বন্ধে জড়িত। অন্যের তৈরি করা সংলাপে যে-কোনো একজন অভিনেত্রীকে কৃত্রিমভাবে সেই আবেগ তৈরি করতে হয় এবং তার পরিবেশনে অভিনেত্রীর থাকে সেই কৃত্রিম আবেগের সঙ্গো জড়ানো অকৃত্রিম শিল্প মায়া। তার থেকে যে জীবনের প্রকাশ, তা হলো

© Santiniketan Sahityapath

শিল্পের জীবন, তা কৃত্রিম হয়েও অকৃত্রিম। লাবণ্য এখানেই ব্যর্থ। অন্যদিকে বাড়িওয়ালার সামনে লাবণ্য যে অভিনয় করে, তা নিষ্ঠুর বাস্তব জীবনেরই। তা আগে জীবন, পরে অন্যের কাছে শিল্প হয়ে ওঠে। বাড়িওয়ালার সামনে বিনয়-লাবণ্যর যে আচরণ, তা সত্যিকারের সম্মান নিয়ে বাঁচার সমস্যাকে সামাল দেওয়ার প্রয়াস। বাড়িওয়ালা চলে যেতেই বিনয় বন্ধু অনিমেষকে বলে সে ও একজন ভালো ডিরেক্টর, তখন অনিমেষ লাবণ্যকেই এ অভিনয়ের কৃতিত্ব দেয়। পাকা অভিনেত্রীর ডিরেক্টরের দরকার হয় না। অনিমেষ বলে, "লাবণ্যর দিকে ফিরে তাকালো অনিমেষ: আপনি মালতি মল্লিকের চেয়ে কোন অংশে কম নন। কিন্তু সেদিন অত ঘাবড়ে গেলেন কেন বলুন তো!" লাবণ্য স্থির দৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত একটু হাসল; মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো। এতখানি তার সাধ্যেও কুলোত না।' লাবণ্যর ধরা গলায় দুই বন্ধু চমকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকাল। লাবণ্যর ঠোঁটে সেই হাসিটুকু এখনও লেগে রয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো হঠাৎ অমন ছল ছল করছে কেন?"[৩]

অভিনেত্রী গল্পে গল্পকারের দেশ ও কাল চকিত জীবনকে দেখার গভীর দৃষ্টি সক্রিয়। লেখক-ব্যক্তিত্ব এ সবের মধ্য দিয়েই পূর্ণ রূপ লাভ করেছে। আলোচনার শুরুতেই আমরা বলেছি নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনের তন্নিহিত বাস্তবতার একজন সফল রূপকার। 'অভিনেত্রী' গল্পে বিনয়-লাবণ্যর দাম্পত্য জীবন ও লাবণ্যর অভিনেত্রী হওয়ার আপ্রাণ প্রয়াস লেখকের জীবনকে দেখার এক বিশেষ দৃষ্টি সামনে আনে। সমগ্র গল্পে লাবণ্যর চরিত্রের দুই ভাগে আছে দু'পাশে নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন স্বাভবের উপযোগী এক সমান্তরাল ভূমি। এই গল্পে রয়েছে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে তার জন্মসূত্রে গৃহীত নৈতিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, তেমনি রয়েছে মানুষের গভীর গোপন মনস্তত্ত্বের প্রচ্ছন্ন বিস্তার। বেঁচে থাকা এবং অস্তিত্ব বজায় রাখা ঠিক এক বস্তু নয়। বিনয় ও লাবণ্যের সংসারে আর্থিক সংকট ছিল, কিন্তু তবু তারা বেঁচে ছিল। তাই যখন লাবণ্য পারেনি তার আজন্ম লালিত সংস্কারের বেড়াজাল পার হয়ে রূপালি পর্দার আলোর জগতে স্বাভাবিক হতে, সে ব্যর্থ হয়ে প্রমাণ করেছে সে অভিনেত্রী নয়, সে চিরন্তন জননী, সে সতী সাধ্বী জায়া। কিন্তু গল্পের শেষে গোবিন্দবাবুর আগমন তার জীবনকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে যেখানে তার অভিনয়টুকু আর শুধুমাত্র অভিনয় নয়, অস্তিত্ব রক্ষার পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বা struggle for existence কীভাবে একটি চরিত্রকে আমূল পাল্টে দিতে পারে তারই অনবদ্য শিল্প রূপ 'অভিনেত্রী' গল্পটি। যদিও লাবণ্য অভিনয়ে পারদর্শী হয়ে উঠতে চায়নি সে কথার ইঙ্গিত রয়েছে গল্পের শেষে। লাবণ্যর চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। আসলে সে অভিনেত্রী নয় বলেই হয়তো এই ইঙ্গিত গল্পটিকে আরো নির্মম, আরো করুণ আরো বাস্তব করে তুলেছে।

উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে বদলে যাওয়া বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের অনিশ্চয়তা সংকট সংঘাতই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের মূল প্রেক্ষিত। নতুন নাগরিক হয়ে ওঠা চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের জীবনের টানাপড়েন নানা মাত্রা পেয়েছে তাঁর ভাবনায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজ প্রতিক্রিয়ায় পরিবারে নারীর স্থান বদল হচ্ছে। বিভিন্ন জীবিকায় চলে যাচ্ছে মেয়েরা, যেতে বাধ্য হচ্ছে — পরিবারের প্রয়োজনে, বেঁচে থাকার তাগিদে। মেয়েদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে স্বামী বা প্রিয় পুরুষের প্রতিক্রিয়া, নতুন ভূমিকায় গ্রহণের দ্বিধা-সাংঘাতই সময়ের সবচেয়ে বড়ো সংকট। মধ্যবিত্ত জীবনের অনিশ্চয়তা ও নাগরিক অস্তিত্ব অর্জনের রেখাচিত্র নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার ১৩৫৬ শারদীয় সংখ্যায়। এই গল্পের পটভূমি ১৯৪৭এর পরবর্তী সময়। স্বাধীনতার আগে থেকেই সুব্রত ও আরতি কলকাতাবাসী। দেশভাগের পর সুব্রতর বাবা-মা ও তিনটি ভাইবোন কলকাতায় চলে আসে। যেহেতু সুব্রত আগের থেকেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত তাই তার পরিবার উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত হলো না। কিন্তু জীবন সংগ্রামের নিরিখে তাদের অবস্থানও বিশেষ উন্নত ছিল না। দেশ থেকে আসা পাঁচটি মানুষের দায়িত্ব নিতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আর্থিক সংকট তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুব্রতর উৎসাহে আরতি চাকরি খুঁজতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সে পেয়ে যায় এক সেলাই মেশিন প্রদর্শক বা ডেমনস্ট্রেটারের চাকরি। সুব্রতর বাবা-মা তীব্র আপত্তি জানালেও সুব্রত এই বাধা মানে না। একশো টাকা মাইনে ছাড়াও মেশিন বিক্রির কমিশনে সংসার কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে। আরতি প্রথমে কিঞ্চিত অপ্রস্তুত ও বিব্রত হলেও অতি দ্রুত নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় মুখার্জী অ্যান্ড মুখার্জী নামক সংস্থায়। আরতিকে চাকরির দিকে অগ্রসর হতে একপ্রকার বাধ্য করেছিল তার স্বামী। সুব্রতর আনা টাকায় পনের দিনও চলে না সংসার। সুব্রত বার বার আরতিকে তার বন্ধুর স্ত্রীদের চাকরি করার কথা শোনাতো। কোন্ কোন্ বন্ধুর স্ত্রী চাকরি করে কত সুবিধা হয় তাদের সংসার চালাতে — সুব্রত বলে পরিমল বাবুর স্ত্রী মাধুরীও চাকরি নিয়েছে। এর আগে আরো কয়েকজন বন্ধু পত্নীর চাকরির খবর দিয়েছে সুব্রত। কারো মাস্টারি, কারো কেরানিগিরি। একটু বাদেই সুব্রত বলে — "পুরুষ

 © Santiniketan Sahityapath

হোক, মেয়ে হোক, আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো? চেষ্টা চরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হোত না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হোত আমার।"[৪]

বদলে যাচ্ছে মানসিকতা, পুরুষ আর্থিক প্রয়োজনে মেনে নিচ্ছে স্ত্রীর আয়ের সহায়তা, ভেঙ্গে যাচ্ছে খানিকটা সেই অচল সমাজের অনড় সংস্কারের পাঁচিলটা। কিছু দিন চাকরি করার পর যখন আরতির কোনো কোনো দিন অফিস থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছে, কাজের চাপ বাড়ছে অত্যন্ত বিরূপ, ক্ষুব্ধ সুব্রত। নানাভাবে আঘাত করতে লাগল আরতিকে। আরতির চালচলন ও ব্যবহার তার কাছে আপত্তিকর মনে হতে থাকে। তার মনে হয় শুধু বাহ্যিক ব্যস্ততা নয়, অন্তরের অনুভূতিগুলিও আরতি বদলে ফেলেছে। সন্তান বা স্বামীর প্রতি সে যেন আর ততটা মনোযোগী নয়। তাকে গ্রাস করেছে, সেলাই মেশিন বিক্রির চিন্তা ও তৎসংক্রান্ত অর্থ উপার্জনের উত্তেজনা। এই ধারণা মনে নিয়ে সে একদিন আরতির অফিসেও যায়। স্ত্রীর কর্মকুশলতার প্রশংসা তাকে আরো অস্থির করে তোলে। আরতিকে পূর্ব পরিচয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য সে নানা চেষ্টা আরম্ভ করে। বাবা-মার সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে নানা অভিযোগ। গল্পের শুরুতে খেয়াল করলে দেখতে পাব, সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরছে নেপথ্যে শ্বাশুড়ির অভ্যর্থনায় স্বামীর নীরব সমর্থন — "এই বোধ হয় এলেন আমাদের মহারানী রাত আটটার সময় ঘরের লক্ষ্মীর ঘর সংসারের কথা মনে পড়ল। দুদিন ধরে মেয়েটার যে জ্বর সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই।"[৫] এই ঘরের লক্ষ্মী ঘরের প্রয়োজনেই বাইরে বেরিয়েছে। সে নিজের ইচ্ছায় যায়নি, স্বামী সুব্রতই সংসারের প্রয়োজনে পাঠিয়েছে চাকরি করতে। আরতিকে দেখে সুব্রতর মনে হয় এই ক'মাসের মধ্যে উপার্জন স্বাধীনতা আরতির মানসিক উচ্চতা অন্যায় রকম ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়। আরতি ঘরে ঢুকে সুব্রতকে হাতের জিনিসগুলি ধরতে বলে মাথার আঁচলটা একটু ঠিক করে নিতে চায় শশুর শাশুড়ির সামনে যাবার আগে, কিন্তু সুব্রত বলে — "সারা রাস্তাটাই যখন বেঠিক হয়ে আসতে পারলে, ঘরে ওটুকু লজ্জা না দেখালেও চলবে।"[৬]

আর্থিক অনিশ্চয়তা মধ্যবিত্ত পুরুষকে বাধ্য করছে সংস্কার ভাঙতে, অভ্যাস বদলাতে। আরতি নিজের ইচ্ছায় চাকরি করতে যায়নি, সুব্রত তাকে প্রায় বাধ্য করেছে। সুব্রতর বাবা-মাও কোনোভাবেই বাড়ির বৌয়ের বাইরে চাকরি করার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। তখন সুব্রত প্রতিবাদ জানিয়েছে, লড়াই করেছে আরতি চাকরির স্বপক্ষে। আরতি অসচ্ছন্দ বোধ করলেও সুব্রত সরেনি তার সিদ্ধান্ত থেকে, কিন্তু চাকরি করা স্ত্রীর স্বাধীন মানসিকতা, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সুব্রত মেনে নিতে পারছে না। সুব্রতর মনে আসে— "টাকা অবশ্য আসে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কথা আসে কানে। ট্রামে বাসে বড় বেশি ঘোরে আরতি। বড় বেশি মেশে স্ত্রী পুরুষ সকলের সঙ্গে। ঘরের বউ ঝিদের পক্ষে এতটা স্বাধীনতা কি ভালো।"[৭]

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করব গল্পের শুরুতে সুব্রতর বাবা প্রিয়গোপালের একটি মন্তব্য — "এত রাত্রি অবধি কোন্ গৃহস্থের বউ বাইরে থাকে! এমন যে হবে, আমি আগেই জানি। আস্তাবলের ঘোড়া আর ঘরের বউ-ঝির রাস যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায় —।"[৮] দুটি অংশকে পাশে রাখলে দেখা যাবে একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে দুই প্রজন্মের দুটি পুরুষ নারীকে একই দৃষ্টিতে দেখছে। শুধু পরের প্রজন্ম নিজেরই প্রয়োজনে স্ত্রীকে উপার্জনের দিকে, বাইরের জগতে এগিয়ে দিচ্ছে কিন্তু উপার্জনশীল স্ত্রীর স্বাধীন মানসিকতা, কাজের গুরুত্ব, স্বনির্ভরতা মানতে পারছে না। সুব্রত ভাবে আরতিকে চাকরি ছাড়াতেই হবে। আরতি ও সুব্রতর সম্পর্ক ক্রমশ বদলে যেতে থাকে। দেশভাগ ও তার পরবর্তী সময় স্বাধীনতার পরের দশক বদলে দিচ্ছে মেয়েদের। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জীবিকার সমস্ত ক্ষেত্রেই পৌঁছে গিয়েছিল মেয়েরা। উত্তর-সাতচল্লিশ বাঙালি জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অনিশ্চয়তা জীবনের অন্য অর্থ, স্বতন্ত্র মূল্যবোধের বিচিত্র ধারাপথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে চাকরিজীবী মধ্যবিত্তকে।

'অবতরণিকার' আরতি সুব্রত সময়ের টানা পোড়েনে তৈরি হয়ে ওঠা নতুন মানুষ। স্বামী এবং পরিবারের প্রতিরোধ এবং প্রয়োজন তাকে লড়াই করতে শিখিয়েছে। আরতি লড়াই করেছে একা তার সমস্ত পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে। সময়ের পরিবর্তন সুব্রতর নানা মুখোশ তৈরি করে দিয়েছে। আরতির লড়াই তার প্রতিটার সঙ্গেই, সেই লড়াইয়ের শেষ পরিণতি তার চরম প্রতিবাদী সিদ্ধান্তে। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও আরতি তার সিদ্ধান্তে অটল। সমস্ত অপমান প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সে লড়াই করে গেছে একা নিঃশব্দে — ভাঙেনি, দুর্বল হয়নি, হেরে যায়নি। যখন সুব্রত তার আদর্শ বিশ্বাস মূল্যবোধ মিথ্যে করে দিল, তার আপোষ করতে না-চাওয়া বাঙালি মেয়ের আবেগ সর্বস্বতা বলে উপহাস করল, যন্ত্রণায় অভিমানে ব্যথায় আরতির দুটো চোখ জলে ভরে আসে। এক সময় চাকরিতে

© Santiniketan Sahityapath

রেজিগনেশন না দিলে বিবাহ বিচ্ছেদের ভয় দেখিয়েছিল সুব্রত আর গল্পের শেষে চাকরি ছাড়ার অপরাধে তাকে আবেগ সর্বস্ব নির্বোধ বলে পরিহাস করে। ভেঙে দিতে চায় তার আত্মবিশ্বাসে অর্জিত শক্ত ভূমিটি। সমস্ত কিছুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের এক অন্য পাঠ গ্রহণ করে আরতি। অবতরণিকা অর্থাৎ সোপান — জীবনের এই ওঠানামা আরতিকে জীবনের নির্মম সত্যের সামনে নিয়ে আসে গল্পের শেষে। এই গল্প আরতির উত্তরণের গল্প।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। তবে নরেন্দ্রনাথের সমকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত একুশ শতকের ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মধ্যবিত্ত বাঙালির নিরিখে নেহাতই 'দিন আনি দিন খাই' শ্রেণির নিম্ন মধ্যবিত্তও নয়, দরিদ্র হিসেবেই বিবেচিত। স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা ও আশাভঙ্গের ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর গল্পে। এ প্রসঙ্গে 'চড়াই উৎরাই' নামের এই গল্পটির আলোচনা করব। এই গল্পটি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই গ্রন্থ নামের সংকলনভুক্ত অন্যতম গল্প। গ্রন্থটির প্রকাশকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তিরও পরে। গল্পটির রচনাকালও এই সময়ের। এই গল্পে গল্পকার একই সঙ্গে দুই শ্রেণির মানুষের, তার পরিবারের জীবন চিত্রের মধ্য দিয়ে নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তের অন্তর্নিহিত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের স্বচ্ছ রূপ এঁকেছেন। নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পে আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের নিচে নামার কখনো বা ওপরে ওঠার, কখনো আবার তারই স্তরে থেকে স্তরগত চিন্তাভাবনা-নির্ভর মানসবৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পরিবার ভিত্তিক জীবনের নিষ্ফলত্ব, অসহায়তাকে হার্দ্য মানবিকবোধে উপস্থিত করার একজন স্বার্থক লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। 'চড়াই উৎরাই' গল্পে তার নিপুণ পরিচয় মেলে।

এই গল্পের কাহিনি বলেছে একজন যুবক। যে জীবন ধারণে বাস্তবিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির, কিন্তু অত্যন্ত সচেতন, স্পর্শকাতর একজন কবি সাহিত্যিক। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় গল্পকথক দুটি নিমন্ত্রণ পত্র পায়। একটি তার নিজের লন্ডন ফেরত, কলকাতার কলেজে পড়ার সময়ের সহপাঠী, এখন ব্যারিস্টার, বন্ধু অসিতের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, আর একটি তার স্ত্রীকে লেখা মল্লিকা নামে তাদেরই পরিচিত এক বিবাহিতা মহিলার সাধারণ পোস্ট কার্ডের চিঠি। দ্বিতীয় চিঠিটি স্ত্রী ইন্দিরার নামে হলেও মল্লিকার চিঠি পেয়ে ইন্দিরা স্বামীকে বলে সন্ধ্যেয় বিয়ে বাড়ি সেরে যেন মল্লিকার বাড়ি একবার ঘুরে আসে। মল্লিকার সঙ্গে গল্প কথকের কিছু পুরনো স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মল্লিকার সঙ্গে প্রেমের সূক্ষ্ম সম্পর্ক বেশি দূর গড়াবার আগেই মল্লিকার বাড়ির সঙ্গে গল্পের কথকের সম্পর্কও চলে যায়। মল্লিকার স্মৃতি একেবারে মুছে যায় মন থেকে।

গল্পের কথক বন্ধু আসিতের বিয়ের দিন সন্ধ্যেয় নিজের কিছু বই ও ফুল উপহার হিসেবে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে বাড়ি এসে উপস্থিত হয়। বিয়ে বাড়িতে যাবার পর অসিত ওকে দেখতে পেয়ে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, কিন্তু পরিচয় প্রসঙ্গে অসিতের বাবার উত্তর এবং অসিতের প্রত্যুত্তরে স্পষ্ট হয়, অসিতের ধনী পিতা কেবলমাত্র প্রয়োজনেই মানুষের সঙ্গে পরিচয় গভীর রাখতে অভ্যস্ত। এমন কি পূর্বপরিচিতকেও চিনে রাখার অনিচ্ছা প্রধান হয়। গল্পকথক চলে যাবার সময় অসিত নিজেই তার ফেরার যানবাহনের ব্যবস্থার কথা বলে। অবশেষে অসিত পূর্ব পরিচিত প্রেমার্থিনী দুই মহিলাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে গল্পকথককে একপ্রকার জোর করে দু টাকার একটি নোট বের করে দেয় রিকশায় করে যাবার জন্য। বন্ধুর বিবাহের এই দিনটি গল্প কথকের কাছে এক আকস্মিক স্বপ্নভঙ্গের গভীর বিস্বাদ ও বিষাদের বিষয় হয়ে ওঠে। এমন মন নিয়ে মল্লিকার সঙ্গে তার অতীতের সূক্ষ্ম মধুর হৃদয় দেওয়া নেওয়ার রোমান্টিক সম্পর্কের কথা ভাবতে ভাবতে পৌঁছে যায় মল্লিকাদের বাড়ি। মল্লিকার বাড়ি থেকেই গল্পকথক বাড়ি ফিরে আসে।

'চড়াই উৎরাই' গল্পের কল্যাণ চরিত্রটি দুই চিত্রে যোজক কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে যেমন দ্রষ্টা তেমনি সেও একজন স্পর্শকাতর, আত্মসচেতন, শিক্ষিত, সাধারণ অভিমানী মধ্যবিত্ত কেরানি। গল্পের মধ্যে অসিতের বাবার চরিত্রটি যথার্থ অর্থে ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। এই শ্রেণির মানুষেরা হয় স্বার্থসর্বস্ব, দাম্ভিক, নিজ শ্রেণিসচেতনতায় এবং আচার-আচরণে কৃত্রিম। মল্লিকার ছেলে ননী ও মেয়ে ময়না মায়ের গোপন নির্দেশেই কল্যাণের কাছে পয়সা চায়। গল্পে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও সূক্ষ্ম তাৎপর্যে ধরা পড়ে। বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্তের বাড়ির এমন এক আচার-আচরণ প্রায় অলিখিত অধিকারের মত কাজ করে অনেক ক্ষেত্রেই। বস্তুত 'চড়াই উৎরাই' গল্পের চরিত্রগুলি কোথাও নিছক চিত্র হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উঠতি ধনী সমাজের, স্বাধীনতা-উত্তরকালের ভেঙে পড়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজ অভিজ্ঞতার স্পষ্ট দলিল হয়েছে।

 © Santiniketan Sahityapath

নরেন্দ্রনাথ মিত্র সব সময়েই গল্প বলেন নিজেরই কথা বলার মতো ভাষায়। স্বচ্ছল তার গতি, অতি অন্তরঙ্গা তার প্রকাশভঙ্গি এবং মধ্যবিত্ত জীবনের এই অন্তর্নিহিত স্বভাবের মতো অকৃত্রিম খোলামেলা তার গঠন। অসিত প্রসঙ্গোর সমগ্র কাহিনিটুকুতে রয়েছে ‘চড়াই উৎরাই’। অসিতের সঙ্গো কোর্টের পরিবেশে কথোপকথনের সময় কল্যাণ যে আন্তরিকতার পরিচয় পায় মধ্যবিত্ত কেরানি বন্ধু হিসেবে এক ধনী বন্ধুর কাছ থেকে, তা বিয়েবাড়ির মধ্যে একাধিক সম্পর্কে ভাঙতে ভাঙতে অসিতের রিক্সা ভাড়া দেওয়া প্রসঙ্গো একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। বন্ধুত্বের আন্তরিকতা ও সম্পর্কের মাধুর্য এমন তিক্ত বিরক্ত অভিজ্ঞতার জন্ম দেওয়ার কারণেই এখানে আছে চড়াই উৎরাইয়ের তাৎপর্য। মল্লিকার কাহিনিতেও তার পরিচয় মেলে। মল্লিকার সহজ আন্তরিক ব্যবহার, আতিথেয়তা, অন্তরঙ্গ স্বভাব মাধুর্য তার শেষতম চিত্রে দু'টাকার নোট আঁচলে বাঁধার ঘটনায় ও এক নাইট একসঙ্গো সিনেমা দেখতে যাওয়ার প্রস্তাবে একেবারে বিস্বাদ হয়ে ওঠে, “বলতে বলতে আঁচলে দু টাকার নোট খানা বেঁধে রাখলো মল্লিকা।... আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘লিখেটিখে খুব বুঝি হচ্ছে আজকাল?’ কিসের এক আনন্দে চকচক করছে মল্লিকার চোখ।... কিন্তু দু-এক নাইট সিনেমা দেখাতে তো পারেন?”[৯] কল্যাণের কাছের সম্পর্ক ভাবনার ওপরে ওঠা থেকে এমন নীচে নামার অভিজ্ঞতায় নামের পরিষ্কার ব্যাখ্যা মেলে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত বাঙালির দাম্পত্য সংকটকে অসাধারণ মুন্সিয়ানার সঙ্গো তাঁর গল্পগুলির মধ্যে তুলে এনেছেন। এ প্রসঙ্গো তাঁর ‘সেতার’ গল্পের কথা বলা যায়। ‘সেতার’ (১৩৫২) গল্পটিতে দাম্পত্য সংকট তৈরি হয়েছে গৃহবধূর রোজগারকে কেন্দ্র করে। নীলিমার স্বামী সুবিমল থাইসিসে আক্রান্ত। ছেলের চিকিৎসা চালাতে গিয়ে বাবা অসহায়। বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি করেও এর সুরাহা হয়নি। একপ্রকার বাধ্য হয়েই বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ি রাজি হয়েছে কুললক্ষ্মীকে বাড়ির বাইরে পাঠাতে রোজগারের জন্য।

সুবিমল সাহায্য চেয়েছিল কলকাতা ও বাইরের বন্ধুদের কাছে। কিন্তু এক দু'মাস পর তাও বন্ধ। রায় সাহেবের বাড়িতে গান শেখাতে গিয়ে নীলিমার জীবনে নতুন এক সম্ভাবনার সূত্রপাত। এখান থেকেই নীলিমার নতুন করে সংগীতচর্চার শুরু, রায়সাহেবের ছেলে পুরন্দরের উদ্যোগে। ত্রিবেদীজীর কাছে কেবল সেতার শেখার উদ্দেশ্য টিউশনে আরো বেশি রোজগার। স্বামীকে সুস্থ করে চেঞ্জে পাঠানোর নিশ্চিত সুযোগ। গান শেখানোর সঙ্গো রোজগার করার এক অদ্ভুত উত্তেজনায় আক্রান্ত হলো নীলিমা। এটা ঠিক যে নীলিমার সমস্ত সংগীত চর্চার কেন্দ্রে ছিল স্বামীর চিকিৎসা। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাই তার সংগীত চর্চার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বন্যার্ত মানুষের জন্য আহ্বান এলে সে ফেলতে পারেনি। মহত্তর আহ্বানে সাড়া দিতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে নীলিমা দাম্পত্য জীবনের চাপে। বস্তুত স্বামীর সুস্থ হয়ে ফিরে আসা এবং নীলিমার জীবনে সংগীত চর্চার ইতি তৎকালীন মানসিকতায় খুবই ‘স্বাভাবিক’ সনাতন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কলোনি জীবনের কথা এখান থেকে পেয়ে যাব। যে নীলিমাকে শ্বশুর-শাশুড়ি বিয়ের পর সামান্য পরীক্ষা দিতে দেয় না তারাই বাধ্য হয় রোজগারের জন্য বাইরে পাঠাতে। বিশ শতকের চারের দশকে দাঁড়িয়ে সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি বদলে যাচ্ছিল, তার প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। একান্নবর্তী পরিবারের এক মহিলার চাকরির জন্য যাওয়া তা নিয়ে পরিবারের মধ্যে তৈরি হয়েছে টানাপোড়েন। কেবলমাত্র পরিবারের আর্থিক অসুবিধার কথা মাথাতে রেখে শাশুড়ি চুপ করে গেছে। আজকালকার দিনে মহিলাদের অনেক কিছু করাতে তার বিশেষ সমর্থন নেই। প্রচলিত সমস্যারগুলির উপর ধাক্কা এলেও বিশ শতকের মেট্রোপলিটন কলকাতার নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি পুরোনোর পক্ষ নিয়েই দাঁড়িয়েছিল। এখানে বাড়ির মহিলার চাকরি করা মানে পরিবারের পাশে দাঁড়ানো নয় বরং সুবিধাবাদী ঝোঁক। এই সমাজ কখনোই বাড়ির মহিলাকে বিকশিত হবার পরিবেশ দেবে না। নীলিমা মহত্তর আহ্বানে সাড়া দিতে চেয়েছিল। উত্তর কলকাতার জলসাতে নীলিমার যাওয়া হলো না। কারণ নীলিমা ‘বাইজীর’ স্বামী হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে। বিশ শতকের অবক্ষয়ী মূল্যবোধের শিকার নীলিমা। মধ্যবিত্ত সমাজের চরম স্বার্থপরতা, মূল্যবোধ হীনতার আঘাত এই ভাবেই সহ্য করতে হয়েছিল নীলিমাকে। সংকটের সময় নীলিমা বাইজিগিরি সামাজিকভাবে স্বীকৃত হলেও আজ আর নয়। আজ স্বামীকে ছেড়ে বন্যার্তদের সাহায্যে গান করতে গেলেও সে অসতীই। সমাজকে আঘাত করার মতো সাহসও তার দেখানো সম্ভব নয়। লখিন্দরের প্রাণ বাঁচানোর জন্য দেবতাদের সামনে নৃত্য করলেও বেহুলা অসতী হয় না। বিশ শতকে যখন মধ্যযুগের মূল্যবোধগুলির ওপর আঘাত আসছে, মধ্যবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো দ্বিচারিতার আশ্রয় নিয়েছে, যার প্রমাণ নীলিমা। নারীকে বলি হতে হয়েছে দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করতে। স্ত্রীরা কেবল সংসার চালানোর উপকরণ মাত্র, তাঁদের নিজস্ব সত্তা নেই। এর প্রমাণ নীলিমা চরিত্রটি, “নীলিমা কুণ্ঠায় সংকোচে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, ‘একটু বাইরে যেতে হবে।’ সুবিমলের মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল, এতকাল বাদে আমি এলাম ঘরে

© Santiniketan Sahityapath

আর তুমি যাবে বাইরে? ... তোমার সুর বেচে কেবল তুচ্ছ টাকায় এতদিন দিয়েছ, আজ এত অল্পেতে ভোলাতে পারবে না। আজ তোমার সেই আসল সুর আমাকে শোনাতেই হবে।”[১০]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের যে আলোচনা এখানে করা হলো, তাতে সবটা তুলে ধরা গেল না। মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে তাঁর আরো অনেক গল্প রয়েছে। এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনেক কিছুই অনালোচিত রয়ে গেল। তবে মধ্যবিত্ত জীবনের বিভিন্ন দিক তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। কোথাও বা দেখা গেছে মধ্যবিত্তের অবনমন, আবার কোথাও উত্তরণ। কেবলমাত্র মধ্যবিত্তের নৈতিক অবক্ষয় দেখিয়েই তিনি থেমে থাকেন নি। মধ্যবিত্ত মানুষের যেমন নৈতিক পদস্খলন ঘটেছে বিভিন্ন কারণে, তেমনি মধ্যবিত্ত মানুষগুলির আত্মিক উচ্চারণ ঘটেছে কিছু কিছু গল্পে। এখানেই গল্পকার হিসেবে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সার্থকতা। এককথায় বলা যায় তিনি মধ্যবিত্তের জীবনের সার্থক রূপকার।

তথ্যসূত্র:

১। ‘বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ’, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, পৃ. ১৩৯

২। ‘গল্পমালা ১’, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, দশম মুদ্রণ, অগস্ট ২০১১, পৃ. ১০

৩। ওই, পৃ. ২১৩

৪। ওই, পৃ. ১২৫

৫। ওই, পৃ. ১২২

৬। ওই, পৃ. ১২৩

৭। ওই, পৃ. ১৩৩

৮। ওই, পৃ. ১২২

৯। ওই, পৃ. ১১৮

১০। ওই, পৃ. ৫১

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বীরেন্দ্র দত্ত, ‘বাংলা ছোটগল্প, প্রসঙ্গ ও প্রকরণ’, দ্বিতীয় খণ্ড, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা

২। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ‘গল্পমালা ১’, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, দশম মুদ্রণ, অগস্ট ২০১১

৩। শ্রাবণী পাল সম্পাদিত, ‘বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশশতক’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৮

৪। শম্পা চৌধুরী সম্পাদিত, ‘প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্প, স্বাধীনতার আগে ও পরে’, রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৮, ভাদ্র ১৪১৫

৫। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা, ‘উজাগর’, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৪১৯, সম্পাদক উত্তম পুরকাইত, উজাগর প্রকাশন

—

© Santiniketan Sahityapath